40

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 APR 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম 2

শিক্ষাঙ্গনে নজিরবিহীন ঘটনা ■ এ পর্যন্ত ২০৭টি জাল সার্টিফিকেট উদ্ধার

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে সার্টিফিকেট জালিয়াতি

মোয়াজ্জেমুল হক, *চট্টগ্রাম অফিস*

ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও জালিয়াতির মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইস্যু হয়ে গেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরীক্ষার শত শত জাল সার্টিফিকেট। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরের একটি জালিয়াত চক্র গত প্রায় এক যুগ ধরে অত্যন্ত সুকৌশলে জন্ম দিয়েছে শিক্ষাঙ্গনে এই নজিরবিহীন কেলেঙ্কারির ঘটনা। সরকারী অনুমোদন নিয়ে গত প্রায় ৪ মাস ধরে চট্টগ্রাম জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরোর শক্তিশালী একটি টিমের অব্যাহত তদন্তে এ পর্যন্ত ২০৭টি ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট জাল বলে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আশির দশকের শুরু থেকে চলে আসা জালিয়াতির সকল ঘটনা উদ্‌ঘাটন করা সময় সাপেক্ষ হলেও তা সম্পন্ন করা গেলে জাল সার্টিফিকেটের সংখ্যা কি পরিমাণে গিয়ে ঠেকবে তা অনুমান করাও মুশকিল। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, এ পর্যন্ত যে ২০৭টি সার্টিফিকেট জাল হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কলেজসমূহের মধ্যে ৫৯টি এবং গত ৬ বছরের শিক্ষাবর্ষের বিএ, বিকম, বিএসসি, বিএসএস, এলএলবি ও অনার্স সাবসিডিয়ারি পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের। এদের অনেকেই পরবর্তীতে আরও উচ্চতর পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে এবং বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্ম জীবনেও ঢুকে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানান, '৯৩ সালে সার্টিফিকেট জালিয়াতির কয়েকটি ঘটনা প্রাথমিকভাবে ধরা পড়ে। তখন ধারণাও করা যায়নি জালিয়াতির এ ঘটনা কত পূর্ব থেকে এবং তা কত গভীরে প্রোথিত। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের বেশিরভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী জালিয়াতির এ ঘটনা থেকে অবৈধ অর্থ আয়ের একটি উপায় করে রেখেছিলেন। '৯৪ সালে এ কেলেঙ্কারির ঘটনার ওপর সিন্ডিকেট সভায় ৭ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি করে দেয়া হয়। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে— তদন্ত কাজ শুরু করার প্রাক্কালে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

(শেষ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

শিক্ষাঙ্গনে নজিরবিহীন

(প্রথম পাতার পর)

দফতরের ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হবে বলে ধারণাও করা যায়নি। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করা গেছে যে, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরের অবিশ্বাস্য ধরনের অনিয়ম ও জালিয়াতি হয়েছে। কমিটি ১২৪ জন পরীক্ষার্থীকে অবৈধভাবে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে বলে রিপোর্ট প্রদান করে। এসব ফলাফলের অন্তর্নিহিত রহস্য ছিল টেবুলেশন শীটে ফেল অথচ গেজেটে টেবুলেশন শীটে ৩য় বিভাগ অথচ গেজেটে প্রকাশ করা হয় ২য় বিভাগ পাসের মোট সংখ্যা ঠিক রাখতে গিয়ে জালিয়াত চক্র পাস করা অনেক ছাত্রকে ফেল দেখিয়ে ফেল করাদের পাসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। এ ছাড়া বিভিন্ন ব্যাপারে অভিযুক্ত অনেক ছাত্রছাত্রীর ফল প্রকাশ করা হয়েছে কর্তৃপক্ষীয় কোন সিদ্ধান্ত দেয়ার আগেই। জালিয়াত চক্র জাল নম্বর ফর্দ ইস্যুর কোন কাউন্টার ফয়েল রাখেনি।

সূত্র জানায়, '৯৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ও ২০ ডিসেম্বর দু'দফায় তদন্ত রিপোর্ট প্রদানের পর সুপারিশ অনুযায়ী সিন্ডিকেট সভায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জি, এম, লতিফ খান, সেকশন অফিসার নাসিরউদ্দিন, উর্ধতন সহকারী কবিরউদ্দিন আহমদ ও উচ্চমান সহকারী আবদুস সাত্তার আখন্দকে চাকরি থেকে ডিসমিস করে। অন্যদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়।

২৯৫তম সিন্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে রেজিস্ট্রার ২৮.৯.৯৫ তারিখে জালিয়াতির তদন্তের জন্য ঢাকায় দুর্নীতি দমন ব্যুরোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংস্থার মহাপরিচালক পরবর্তীতে অনুসন্ধানের মঞ্জুরি প্রদান করলে ঐ বছরের ১২ নবেম্বর চট্টগ্রাম জেলা দুর্নীতি দমন অফিসারের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের একটি শক্তিশালী তদন্ত টিম তাদের তদন্ত শুরু করে। বর্তমানে এ তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং ২০৭টি জাল সার্টিফিকেট ইস্যুর সুনির্দিষ্ট ঘটনা উদ্‌ঘাটন করেছে। সেকশন অফিসার (চাকরিচ্যুত) নাসিরউদ্দিনই জালিয়াতির প্রধান নায়ক বলে তদন্তে বেরিয়ে আসছে। তাঁর সাথে জড়িয়ে পড়েন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (তৎকালীন) জিএম লতিফ খানসহ অন্যরা। চট্টগ্রামের ষোলশহরের মীর্জাপুর হাউজিং সোসাইটিতে নাসিরউদ্দিনের মালিকানাধীন দৃষ্টিনন্দন ৫ তলা ভবন নির্মাণের উৎস কোথায় দুর্নীতি দমন ব্যুরো তাও খতিয়ে দেখছে বলে সূত্র জানায়।